OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 89
Website: https://tirj.org.in, Page No. 794 - 801
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 794 - 801
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

রবীন্দ্র ব্যক্তিত্বে পরিবার পরিজনের প্রভাব : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ছেলেবেলা’ — একটি আলোচনা

তাপস মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : tapasmandal2511@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Rabindranath, Dwijendranath, Satyendranath, Hemandranath, Jyotirindranath, Kadambari Devi, Childhood, Relatives, Autobiography, Personality, Chelebela.

Abstract
The Creation makes the creator immortal. But in order to express one’s own story one needs to write an autobiography. Because through an autobiography writer/ author reveals himself/ herself to the readers. So that autobiography is the best way to know the writer/ author deeply and personally. Rabindranath Tagore wrote three autobiographies during his life-span. Those are ‘Jibansmriti’ (1912), ‘Chelebela’ (1940) and ‘Atmaparichoy’ (1943). Rabindranath Tagore wrote the book 'Chelebela' for boys at the request of Nityanandabinod Goswami, the professor of literature of Shantiniketan Vidyalaya. In this book Rabindranath Tagore recollected his childhood. But here he didn’t describe the continuous account of boy Ravi. Instead he reminisced the reasons why Ravi became Rabindranath Tagore. No man can grow alone. One grows up in family and Society. So that the role of environment, society, family and relatives are enormous in the formation of personality. And Rabindranath Tagore is not an exception. In the book ‘Chelebela’ Rabindranath Tagore focused on the history of the boy Ravi's growth in vitality. So as usual the description of farmer Calcutta, the rules and systems of Tagore’s family and relatives brought up in his reminiscence of childhood. In ‘Chelebela’ while Rabindranath Tagore talking about his family specially mentioned his four elder brothers’ — Dwijendranth Tagore, Satyendranath Tagore, Hemendranath Tagore and Jyotirindranath Tagore. However, the contribution of Kadambari Devi is not left out. Ravi’s childhood was spent on a small scale surrounded by servants. But that couldn’t clasp the boy Ravi. The vast experience and the independent thinking of the elders influenced the imaginative mind of boy Ravi little by little. Especially for the boy Ravi becoming Rabindranath Tagore, the education system of Hemendranath Tagore, the philosophy of Dwijendranath Tagore, the modern mentality of Satyendranath Tagore, the musical education and the sense of

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 89
Website: https://tirj.org.in, Page No. 794 - 801
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

realism of Jyotirindranath Tagore and the extraordinary personality of Kadambari Devi have been mentioned here.

Discussion

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—

"কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।"[১]

তবু খ্যাতির বিড়ম্বনায় তাঁকেই বারবার রচনা করতে হয়েছিল আত্মচরিত; একটি নয় তিনটি — 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২), 'ছেলেবেলা' (১৯৪০), এবং 'আত্মপরিচয়' (১৯৪৩)। 'আত্মপরিচয়' হল তথ্যের নির্যাস, যা একান্তভাবে মননশীল মানুষের পাঠের যোগ্য। 'জীবনস্মৃতি' বালক রবির রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠার ব্যঞ্জনাময় কাহিনি আর 'ছেলেবেলা' ছেলেদের জন্য বালভাষিত গদ্যে লেখা 'কাহিনী নয় কাকলি'। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক শ্রী নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী অর্থাৎ গোঁসাইজির অনুরোধে ছেলেদের জন্য কিছু লেখার মানসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেছিলেন 'ছেলেবেলা' গ্রন্থটি। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি স্পষ্ট করেই বলেছিলেন — মনঃপ্রকৃতি যে বিচিত্র পারিপার্শ্বিকের আকস্মিক এবং অপরিহার্য সমবায়ে ক্রমশ পরিণত হয়ে ওঠে — তারই বিবরণ আছে উক্ত গ্রন্থটিতে। তিনি জানতেন ছেলে মানুষের বৃদ্ধি আসলে তার প্রাণশক্তির বৃদ্ধি; বালক তাকেই হৃদয়ে গ্রহণ করে যা তার প্রাণের সঙ্গে আপনি মেলে। ছেলেবেলার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বালক রবির কৈশোরপ্রাপ্তির দিনগুলির স্মৃতি এখানে উপস্থিত। বালক রবির কথা বলতে গিয়ে লেখক সেকালের কলকাতা এবং ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের পাশাপাশি বালক রবিকে ঘিরে থাকা পরিবার পরিজনের প্রভাবের কথা সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্র স্নেহধন্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন —

> "রবীন্দ্রনাথের জন্মের সময় দেবেন্দ্রনাথের বয়স পঁয়তাল্লিশ বৎসর; তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের বয়স একুশ; মধ্যম সত্যেন্দ্রনাথ উনিশ বৎসরের যুবক, সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে বিলাত যাচ্ছেন; পরবর্তী সন্তান হেমেন্দ্রনাথের বয়স সতেরো; জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স তেরো। অন্য ভাইদের কথা বললাম না, কারণ এই চার জ্যেষ্ঠ সহোদরের প্রভাবই রবীন্দ্রনাথের উপর বিশেষভাবে পড়েছিল।"[২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ছেলেবেলা'র স্মৃতিচারণায় রবীন্দ্র ব্যক্তিত্বে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর— এই চার জ্যেষ্ঠ সহোদরের প্রভাব তাৎপর্যপূর্ণভাবে স্মরণ করেছেন। তবে শুধুমাত্র এই চার সহোদরই নয়, রবীন্দ্র ব্যক্তিত্বে কবির নতুন বউঠান অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী কাদম্বরী দেবীর প্রভাবের কথাও তুলে ধরেছেন অত্যন্ত মননঋদ্ধ ভঙ্গিমায়।

বালক রবির রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়ে ওঠার পিছনে নানা মানুষের ভূমিকা ছিল। তাঁর লেখাপড়ার প্রধান আয়োজক ছিলেন সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বলতেন —

> "আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি, তার পরে ইংরেজি শেখার পত্তন।"[৩]

রবির পড়াশোনার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। তাঁর চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। সে কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছেন—

> "সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পড়াশোনার জাঁতাকল চলছেই ঘরঘর শব্দে। এই কলে দম দেওয়ার কাজ ছিল আমার সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের হাতে। তিনি ছিলেন কড়া শাসনকর্তা।"[৪]

হেমেন্দ্রনাথ নিজের মতো করে রবিকে শিক্ষিত করার জন্য কুস্তি, অস্থিবিদ্যা, ব্যাকরণ, গণিতশাস্ত্র ইত্যাদি শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু আশৈশব মানুষের স্নেহসঙ্গ বঞ্চিত বালক রবি নিয়মের জাঁতাকলে নিজেকে জুড়ে দিতে পারেননি। তবে বালক রবি যথার্থ উপকৃত হয়েছিলেন এক শিক্ষকের অভিনব শিক্ষাদানের প্রচেষ্টায়। আনন্দচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য বুঝেছিলেন লেখাপড়া শেখার প্রচলিত পথে এই বালক রবিকে চালিত করা যাবে না। তাই তিনি 'কুমারসম্ভব' মুখস্ত করিয়ে, 'ম্যাকবেথে'র তর্জমা করিয়ে অভিনব উপায়ে বালক রবির মনে সাহিত্যরস সঞ্চারের ব্যবস্থা করেছিলেন। ভৃত্যরাজক তন্ত্রে বন্দি বড় মানুষদের অদ্ভুত নিয়মের অন্তঃপুর থেকে সদা বিচ্ছিন্ন বালক রবির নিঃসঙ্গ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 89
Website: https://tirj.org.in, Page No. 794 - 801
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কল্পনাতুর জীবনে জ্যোতিদাদা আর নতুন বউঠান রস বর্ষণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই দুইজনের সংস্পর্শে বালক রবির জীবনে কী পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল 'বালক' কবিতার ছড়ার ছন্দে রবীন্দ্রনাথ তা লিপিবদ্ধ করেছেন —

"বেহালাটা হেলিয়ে কাঁধে ছাদের 'পরে দাদা,
সন্ধ্যাতারার সুরে যেন সুর হ'ত তাঁর সাধা।
জুটেছি বউদিদির কাছে ইংরেজি-পাট ছেড়ে,
মুখখানিতে ঘের-দেওয়া তাঁর শাড়িটি লাল-পেড়ে।
চুরি ক'রে চাবির গোছা লুকিয়ে ফুলের টবে
স্নেহের রাগে রাগিয়ে দিতেন নানান উপদ্রবে।"[৫]

এই কয়েক পঙ্‌ক্তির মধ্যে জ্যোতিদাদা ও বউদিদির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক সম্পর্ক বন্ধনটি চমৎকারভাবে লোভ্য। 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে জ্যোতিদাদার গুরুত্ব বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চমৎকার ভাষায় বলেছেন —

> "আমার নির্জন বেদুয়িনি ছাদে শুরু হল আর-এক পালা— এল মানুষের সঙ্গ, মানুষের স্নেহ। সেই পালা জমিয়ে দিলেন আমার জ্যোতিদাদা।"[৬]

শুধু জ্যোতিদাদা নয়, বালক রবির নিঃসঙ্গ জীবনে তাঁর প্রাণশক্তির বিকাশে নতুন বউঠানও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে জ্যোতিদাদা উপস্থিত হয়েছিলেন নির্জলা নতুন মন নিয়ে। আগে যেখানে বড় ছোটর চলাচলের মধ্যে ছোট সাঁকোটা ছিল না সেখানে জ্যোতিদাদা বালকের আলাপকে অতুলনীয় সহৃদয়তার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কোনোদিনই বালকের প্রলাপকে জ্যাঠামি বলে স্তব্ধ করে দিতে চাননি। তাঁরই আগ্রহে ছাদের ঘরে এসেছিল পিয়ানো। পিয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছিল গানের ফোয়ারা। জ্যোতিদাদা পিয়ানো বাজিয়ে সুর তৈরি করতেন আর সেই সুরকে কথার বাঁধনে অক্ষয় করে রাখার দায়িত্ব ছিল বালক রবির ওপরে। বালক বলে জ্যোতিদাদা তাঁকে কখনও অগ্রাহ্য করেননি। বরং সেই প্রশ্রয়ে সুরের সঙ্গে কথা বসানোর কাজে ধীরে ধীরে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন ভবিষ্যতের সেই রবীন্দ্রনাথ। যিনি বিশ্বাস করতেন তাঁর সব কীর্তির মধ্যে স্থান পাবে তাঁর গান। শুধু পিয়ানো বাদনই নয় জ্যোতিদাদা সন্ধেবেলা স্নান সেরে পাতলা চাদর গায়ে দিয়ে বউঠানের সযত্ন রচিত সুগন্ধ পুষ্পশোভিত ছাদের বাগানে বসে বেহালায় লাগাতেন ছড়ি; বালক রবিকে ধরতে হত চড়া সুরের গান। দাদা ভাইয়ের সেই যুগলবন্দি সুর সূর্য ডোবা আকাশে ছাদ থেকে ছাদে ছড়িয়ে পড়ত। আর একসময় আকাশের কালো পর্দা ছিঁড়ে উঁকি মারতে শুরু করত ঝকমকে তারার দল।

জ্যোতিদাদাই রবিকে ঘোড়া চড়তে শিখিয়েছিলেন। তিনি যখন শিলাইদহে যেতেন তখন বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে বন্দি বালক রবিকে মুক্তি দেবার জন্য নিয়ে যেতেন পদ্মা পাড়ের উন্মুক্ত প্রসারতার মাঝে। জ্যোতিদাদা শিলাইদহে বসবাসকালে রবির জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন একটা ছোট্ট টাট্টু ঘোড়া; এবড়োখেবড়ো মাঠে পড়ি পড়ি করে রবি সেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘুরে আসতেন। তবে রবি যেদিন কলকাতাতে মেজাজি ঘোড়ার পিঠে চড়েছিলেন সেদিনের ঘোড়ার দৌড়টা মোটেও সুখাবহ হয়নি। পরিণামে ঘোড়া আর সওয়ারের চিরন্তন বিচ্ছেদ ঘটেছিল। জ্যোতিদাদার ছিল বাঘ শিকারের নেশা। তাই বাঘ শিকারে যাওয়ার সময় জ্যোতিদাদা সঙ্গী করতেন বালক রবিকে। এই শিকারে গিয়ে রবি শুনেছিলেন বাঘের ভীষণ গর্জন। সেই সঙ্গে আরও একবার দেখতে পেয়েছিলেন খোলা মাঠের মধ্যে দিয়ে এক দুরন্ত বাঘের ছুটন্ত গতি। বলা বাহুল্য এইসব অভিজ্ঞতা বালক রবির জীবনে সর্বোপরি তাঁর ব্যক্তিত্বে রস সঞ্চার করেছিল।

বালক রবির জীবনে জ্যোতিদাদার প্রভাব আরও নানা দিক থেকে দেখা দিয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বালক রবির সব তর্কের জবাব যথেষ্ট ধৈর্যের সঙ্গে দিতেন। তিনি বুঝেছিলেন স্কুল পলাতক এই বালকের শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলি। সেই জন্য তিনি জমিদারির কাজে শিলাইদহ গেলে বালক ভাইটিকেও সঙ্গে নিতেন। তখনকার দিনের বিচারে ঘটনাটা ছিল বেদস্তুর। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন তাঁর বালক ভাইটির আকাশে বাতাসে চড়ে বেড়ানো মন আকাশ বাতাস থেকে পায় মনের খোরাক। এই

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 89
Website: https://tirj.org.in, Page No. 794 - 801
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কারণেই চিৎপুরের সরু গলির বাইরে শিলাইদহের আদি-অন্ত্যহীন প্রসারতার মাঝখানে বালক রবিকে ছেড়ে দিতেন। পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ এই কথা স্বীকারও করেছেন—

> "তার কিছুকাল পরে জীবনটা যখন আরো উপরের ক্লাসে উঠেছিল, আমি মানুষ হচ্ছিলুম এই শিলাইদহে।"[৭]

জ্যোত্যিদাদা শিলাইদহে বাসকালে বালক রবির জন্য বরাদ্দ করেছিলেন দোতলার এমন এক ঘর যার সামনে ছিল মস্ত একটা ছাদ আর লম্বালম্বা ঝাউয়ের সারি। এই বাড়িটি ছিল অতীতের নীলকুঠি। সেই মস্ত ছাদের বাতায়নের পাশে বসেই বালক রবি অতীতের দিনগুলিকে যেন কল্পনায় দেখতে পেতেন। অর্থাৎ জ্যোতিদাদার দেওয়া অবকাশেই বালক রবির মনের পাত্র কল্পনার সুধায় ভরে ওঠার সুযোগ পেয়েছিল। শিলাইদহের এই মনমুগ্ধকর অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে সুন্দর ভাষারূপ পেয়েছে—

> "একলা থাকার মন নিয়ে আছি। ছোটো একটি কোণের ঘর, যত বড়ো ঢালা ছাদ তত বড়ো ফলাও আমার ছুটি। অজানা ভিন্ দেশের ছুটি, পুরোনো দিঘির কালো জলের মতো তার থই পাওয়া যায় না। বউ-কথা-কও ডাকছে তো ডাকছেই, উড়ো ভাবনা ভাবছি তো ভাবছিই। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার খাতা ভরে উঠতে আরম্ভ করেছে পদ্যে। সেগুলো যেন ঝরে পড়বার মুখে মাঘের প্রথম ফলনের আমের বোল— ঝরেও গেছে।"[৮]

জ্যোতিদাদার আর একটা গুণ ছিল তিনি অপরের ইচ্ছাকে মান্য করতেন। একবার বালক রবির ইচ্ছা হয়েছিল ফুলের রস দিয়ে কবিতা লিখবেন। এ কথা শুনে জ্যোতিদাদা ছুতোর ডেকে ফুলের রস বের করে লেখার কালি প্রস্তুত করার সমস্ত বন্দোবস্ত করেছিলেন। কিন্তু তার সত্বেও ওই কালি দিয়ে বালক রবির কবিতা লেখা হল না; তবুও তিনি কৌতূহলী বালকটির উদ্দেশ্যে কোনো ভর্ৎসনা বাক্য উচ্চারণ করেননি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহিত্যবোধ ছিল অসাধারণ। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত নাট্যকার। ঠাকুর বাড়ির চিলেকোঠার ছায়ায় জ্যোতিদাদা কফি খেতে খেতে বালক রবিকে তাঁর নিজের লেখা নাটকের খসড়া পড়ে শোনাতেন। শুধু তাই নয় নাটকের অংশ বিশেষে কিছু কথা বা গান জুড়ে দেওয়ার দায়িত্বও দিতেন বালক রবিকে। জ্যোতিদাদার এই উদারতায় বালক রবির আত্মবিশ্বাস নিশ্চয়ই বেড়েছিল।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি দুই মহলে বিভক্ত ছিল। পুরুষেরা থাকতেন বাহির মহলে আর মেয়েরা থাকতেন অন্দরমহলে। অভিজাত বাড়ির নিয়ম অনুযায়ী মেয়েদের কোঠায় ছেলেমানুষদের প্রবেশের অধিকার ছিল না। তাই যেদিন বারোয়াঁ সুরে সানাই বেজেছিল, বাড়িতে এসেছিল কচি শামলা হাতের সোনার চুড়ি পরা বউ (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী কাদম্বরী দেবী); সেদিন সেই মায়াবী দেশের নতুন মানুষদের কাছে ঘেঁষতে গিয়ে বালক রবিকে খেতে হয়েছিল ধমক। বিরস মুখে তাঁকে ফিরে যেতে হয়েছিল ছ্যাৎলা পড়া পুরনো ঘরের আড়ালে। তবে যেদিন নতুন বউঠান ছাদের লাগোয়া ঘরের কর্তৃত্ব পেলেন সেদিন পুরো ছাদটাই এল বালক রবির দখলে। শুধু তাই নয় নতুন বউঠানের পুতুলের বিয়ের আসরে প্রধান অতিথির আসন জুটত বালক রবির কপালে। রন্ধন নিপুনিকা এই নতুন বউঠান খাওয়াতেও ভালবাসতেন। তাঁর সখ মিটত স্কুল ফেরত রবির সানুরাগ উপস্থিতিতে। নতুন বউঠানের মেখে দেওয়া পান্তা ভাতের সঙ্গে লঙ্কার আভাস দেওয়া চিংড়ির চচ্চড়ি সেদিন বালক রবির জিভের স্বাদের সাথে সাথে মনের স্বাদও বদলে দিতে শুরু করেছিল। ক্রমে ক্রমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী কাদম্বরী দেবী অর্থাৎ বালক রবির নতুন বউঠান আর দেবর রবি হয়ে উঠেছিলেন একে অপরের খেলার সাথী। নতুন বউঠানের সংস্পর্শে এসে এতদিনকার নিঃসঙ্গতা সরিয়ে বালক রবি স্নেহ-কৌতুকে, কপট বিবাদে মানব সম্পর্কের বিচিত্র ধারাকে আস্বাদন করতে থাকেন। নতুন বউঠানের স্নেহসঙ্গ বালক রবির জীবনে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে, মাত্র কয়েকদিনের জন্য নতুন বউঠান অন্য কোথাও গেলে বালক রবি ভ্রাতৃবধূর কোনো একটা দামি জিনিস লুকিয়ে রেখে ঝগড়ার পত্তন করে বলতেন —

> "তুমি গেলে তোমার ঘর সামলাবে কে? আমি কি চৌকিদার!"[৯]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 89
Website: https://tirj.org.in, Page No. 794 - 801
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নতুন বউঠান বালক রবির অহেতুক চৌকিদারিত্বের গূঢ় কারণটি হৃদয়ঙ্গম করে রাগ দেখিয়ে বলতেন —

"তোমাকে আর ঘর সামলাতে হবে না, নিজের হাত সামলিয়ো।"[১০]

বালক রবির নতুন বউঠান ছিলেন অত্যন্ত গুণবতী। তিনি প্রয়োজনের বস্তুকেও সৌন্দর্যের আবরণে মুড়ে প্রয়োজনাতীত রস পরিবেশনে সক্ষম ছিলেন। তাঁরই আগ্রহে ঠাকুর বাড়ির ছাদে রচিত হয়েছিল উদ্যান। সেখানে ফুটত বেলফুল, জুঁইফুল, চামেলী, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, দোলনচাঁপা। এই ছাদের বাগানে জ্যোৎস্না রাত্রে যখন গানের আসর বসত তখন সেই আসরে নতুন বউঠান রুপোর রেকাবিতে সাজিয়ে দিতেন বেলফুলের গোড়েমালা; তা ঢাকা থাকত ফুলকাটা রুমালে। সঙ্গে থাকত বরফ দেওয়া জল আর বাটাতে থাকত ছাঁচি পান। নতুন বউঠান তাঁর সযত্ন ছোঁয়ায় প্রাত্যহিকের বিবর্ণতাকে অনেকটাই ঢেকে দিতেন। দুপুরবেলা জ্যোতিদাদা কাছারিতে বসলে নতুন বউঠান সযত্নে ফলের খোসা ছাড়িয়ে সাজিয়ে দিতেন, সঙ্গে থাকত হাতে গড়া মিষ্টি আর তার উপরে ছড়ানো থাকত গোলাপের পাপড়ি; রুপোর গ্লাসে থাকত ডাবের জল অথবা ফলের রস। কখনও বা থাকত বরফে ঠাণ্ডা করা তালের শাঁস— সমস্ত জলখাবারটা মোরাদাবাদী খুঞ্জেতে সাজিয়ে ফুলকাটা রেশমের রুমালে ঢেকে পাঠিয়ে দিতেন বার মহলে। নতুন বউঠানের সযত্ন আতিথেয়তায় বালক রবি সেই বয়সে প্রত্যক্ষ করেছিলন কীভাবে সাধারণকে অসাধারণ করে তোলা যায়। মাঝে মাঝে জ্যোতিদাদা যখন হাওয়া বদলের জন্য গঙ্গার ধারে বাগানে যেতেন তখন সঙ্গে নিতেন বালক রবি ও রবির নতুন বউঠান কাদম্বরী দেবীকে। গঙ্গার ধারের দোতলা বাড়িতে বসে রবি দেখেছিলেন গঙ্গার বুকে কালো মেঘের ঘনিয়ে তোলা ছায়া; উপরে কালো মেঘের রাশি নিচে গঙ্গায় ঢেউ উঠছে। সেদিনের এই অভিজ্ঞতাকে করুণ বিরহের রাগিনীতে ভরে নিতে চেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আশ্রয় করেছিলেন বিদ্যাপতির একটি পদে—

"এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।"[১১]

পরে জ্যোতিদাদা বাসা বদল করেছিলেন মোরান সাহেবের বাগানে। সেটা যেন রাজবাড়ি। রঙীন কাঁচের জানালা দেওয়া ঘর, মেঝে মার্বেলে মোড়া; গঙ্গা থেকে সিঁড়ি উঠেছে লম্বা বারান্দায়। সেই বারান্দায় চাঁদনী রাতে রবির মনে যেন ঘোর লাগত। মোরান সাহেবের বাগান বাড়ির বকুলতলায় প্রায়ই বসত চড়ুইভাতির আসর। নতুন বউঠান নানা ব্যঞ্জনের স্বাদ দিতেন বালক রবির রসনায়। রসনার পথেই বালক রবির হৃদয় সরস হয়ে উঠত। এই কারণেই বুঝি রবীন্দ্রনাথ নববধূকে পরামর্শ দিতে ভুলতেন না —

"পাক প্রণালী'র মতে করো তুমি রন্ধন
জেনো ইহা প্রণয়ের সব-সেরা বন্ধন।"[১২]

আমরা একটু ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বুঝতে পারব তুচ্ছ গল্পকথার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেন এই ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন যে, নতুন বউঠানের সংস্পর্শে তাঁর শুধু মানব পিয়াসী মনের মরুতা দূর হয়নি। স্বাদে, গন্ধে, বর্ণে, তাঁর চিত্তও পুলকিত হয়ে উঠেছিল। নতুন বউঠান বালক রবির সাহিত্য চর্চার সঙ্গী হতেন ঠিকই কিন্তু বালক রবির রচনাকে তিনি কখনোই প্রশংসায় ধন্য করতেন না। কাদম্বরী দেবীর কাছে বিহারীলাল চক্রবর্তী ছিলেন আদর্শ লেখক। বিহারীলালের তুলনায় বালক রবির সাহিত্য সৃষ্টিকে অকিঞ্চিৎকর বলে হয়তো বা এই বুদ্ধিমতী বধূটি প্রতিভাবান বালক দেবরের মধ্যে ঈর্ষা জাগ্রত করে সার্থকতর রচনার পরোক্ষ প্রেরণা যোগাতেন। সুতরাং পারিপার্শ্বিক সমস্ত দিক বিবেচনা করে একথা বলা বোধহয় অন্যায় হবে না যে, রবীন্দ্র ব্যক্তিত্বে কবির নতুন বউঠান অর্থাৎ কাদম্বরী দেবীর প্রভাব ব্যতীত তিনি আদৌ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়ে উঠতেন কি না তা ভেবে দেখার বিষয়।

বালক রবির রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠার পিছনে ঠাকুর বাড়ির যেসব মানুষের সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছিল তাঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান অন্যতম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বভাবে ছিলেন খেয়ালী মানুষ। দর্শনের নানা গভীর তত্ত্ব নিয়ে তিনি সর্বদা মগ্ন থাকতেন। কাউকে ধরে বেঁধে তত্ত্বকথা শোনানোর জন্য তাঁর উৎকণ্ঠার অন্ত ছিল না। তাই তাঁর ফাঁদে সহজে কেউ পা রাখতে চাইতেন না। অথচ বালক রবি অনেক সময়ে এই ঋষিতুল্য মানুষটির সহিষ্ণু শ্রোতা ছিলেন। ঠাকুর বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় নিয়মিত ঝরে পড়ত আনন্দের নির্ঝর ধারা।

'স্বপ্নপ্রয়াণ' পড়তে পড়তে তিনি উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়তেন। এই ঋষিতুল্য মানুষটির সদানন্দ জীবনবোধেই বালক রবির অস্তিত্বের মধ্যে আনন্দবোধের উৎসারণ ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ জিজ্ঞাসা ও বিশ্বরহস্য জিজ্ঞাসা পূরণে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা অনুভব করা যায়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একজন সুদক্ষ সাঁতারু। তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং উৎসাহে বালক রবি সাঁতারে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। সাঁতার শিক্ষার সেই বর্ণনা রবীন্দ্র দৃষ্টিতে অনবদ্য রূপ লাভ করেছে —

> "বড়দাদার আর-একটি অভ্যাস ছিল চোখে পড়বার মতো, সে তাঁর সাঁতার কাটা। পুকুরে নেমে কিছু না হবে তো পঞ্চাশ বার এ পার-ও পার করতেন। পেনেটির বাগানে যখন ছিলেন তখন গঙ্গা পেরিয়ে চলে যেতেন অনেক দূর পর্যন্ত। তাঁর দেখাদেখি সাঁতার আমরাও শিখেছি ছেলেবেলা থেকে। শেখা শুরু করেছিলুম নিজে নিজেই। পায়জামা ভিজিয়ে নিয়ে টেনে টেনে ভরে তুলতুম বাতাসে। জলে নামলেই সেটা কোমরের চারদিকে হাওয়ার কোমরবন্দর মতো ফুলে উঠত। তার পরে আর ডোববার জো থাকত না।"[১৩]

মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর প্রভাবও রবীন্দ্রনাথের উপর প্রবল ভাবে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ অনেক বিষয়েই ছিলেন সেকালের মানসিকতার তুলনায় প্রগতিশীল। এই তরুণ সিভিলিয়ানটি সেকালের প্রচলিত রীতি এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ঠাকুর বাড়ির বধূকে অর্থাৎ নিজের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীকে নিজের কর্মক্ষেত্রে নিয়ে গিয়ে সেদিনকার মানুষদের হতভম্ব করে দিয়েছিলেন। ঠাকুর বাড়ির চিরকালীন প্রথা ভাঙতে তাঁর বিন্দুমাত্র সাহসের অভাব হয়নি। আপাত দৃষ্টিতে রবীন্দ্র জীবনের সঙ্গে এই ঘটনা সম্পর্কহীন মনে হলেও বালক রবির মনে এর সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়েছিল বলেই মনে হয়। কারণ আমরা দেখেছি তাঁর 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের নায়িকা মৃণাল পরিবারের অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে এসেছিল। মৃণালের এই স্পর্ধিত কার্যক্রমের পিছনে ঠাকুর বাড়ির নতুন কালের বউ জ্ঞানদানন্দিনীর প্রভাব থাকা সম্ভব বলেই মনে করা যেতে পারে।

জ্ঞানদানন্দিনী ও সত্যেন্দ্রনাথ লেখাপড়ায় অমনোযোগী বালক রবিকে সমাজ ও পরিবারের পক্ষে উপযোগী করে তোলবার জন্য ইংল্যান্ডে পড়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তারই প্রস্তুতি হিসেবে বিলাতি চালচলনের গোড়া পত্তনের জন্য আপন কর্মক্ষেত্রে আমেদাবাদে রবিকে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই নতুন পরিবেশে প্রতি পদক্ষেপে অনভ্যস্ত সৌজন্য ও শিষ্টাচার কিশোর রবিকে প্রায়শই ক্লেশ দিত। ফলে কিশোর রবি অন্যপথে নিজের মুক্তি খুঁজে নিয়েছিলেন। জর্জসাহেব থাকতেন আমেদাবাদের সাহীবাগে বাদশাহী আমলের এক রাজবাড়িতে। সঙ্গীহীন অবস্থায় এখানে রবির দিন কাটত ক্লেশকর নিঃসঙ্গতায়। তাই নির্জন নিস্তব্ধ দুপুরে বালক রবি শাহীবাগের এই রাজপ্রাসাদের নিকট বিরাট শূন্য ঘরে আলোছায়ার রহস্যময় আল্পনা দেওয়া অলিন্দপথে ভূতগ্রস্থের মতো ঘুরে বেড়াতেন। কলকাতায় থাকাকালীন সময়ে ইতিহাসের চেহারা দেখবার সুযোগ রবির জীবনে আসেনি। কিন্তু শাহীবাগের এই বাড়িতে দাঁড়িয়ে রবির মনে হত চলতি ইতিহাস যেন থেমে গেছে; শুধু—

> "দেখা যাচ্ছে তার পিছন ফেরা বড়ো ঘরোআনা। তার সাবেক দিনগুলো যেন যক্ষের ধনের মতো মাটির নিচে পোঁতা।"[১৪]

সেই নির্জন দুপুরে পুরনো ইতিহাসের হাড় বেড়করা কাঠামোর উপর কল্পনার মুখোশ আর মুকুট পরিয়ে নিয়েছিলেন বালক রবি। সেখানেই রোপন করা হয়েছিল 'ক্ষুদিত পাষাণ'-এর বীজ। আমরা বুঝতে পারি নিঃসঙ্গ বালক রবি আমেদাবাদের দিনগুলিতে ইতিহাস আর কল্পনার মিশেলে তৈরি এক রহস্যময় জগতের খোঁজ পেয়ে গিয়েছিলেন। ওই জগতের রস তাঁর সত্তার গভীরে সঞ্চারিত হয়েছিল বলেই পরবর্তীকালে তাঁর অজস্র রচনার মধ্যে ইতিহাস আর কল্পনার সহাবস্থান ঘটেছিল। তবে আমেদাবাদের দিনগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ ধারণা ছিল রবির বিদেশ যাত্রার আগে দেশের মাটিতে বিদেশের রস সঞ্চার করতে পারে এমন ছেলে মেয়ের সঙ্গে রবিকে মিলিয়ে দিতে পারলে রবির মন হয়ে উঠবে সজীব। সেই মতো রবিকে চলে যেতে হয়েছিল বোম্বাইয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধু আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গের বাড়িতে। আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গের কন্যা আন্না তড়খড় 'পড়াশোনা ওয়ালা মেয়ে'; বিদেশ থেকে মেজে এনেছিলেন তাঁর শিক্ষা। বালক রবি এই আন্না তড়খড়ের কাছেই ইংরেজিয়ানার মক্‌স করেন। এই ব্যবস্থায় রবির ইংরাজি শিক্ষার উন্নতি কতটা হয়েছিল তা

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 89
Website: https://tirj.org.in, Page No. 794 - 801
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিষয়। তবে ততদিনে বালক রবির নতুন শিক্ষয়িত্রীটির কাছে আভাসে ইঙ্গিতে ব্যঞ্জিত হয়েছে বালক রবির কবিত্ব সত্তাটি। ফলত স্বাভাবিকভাবেই আন্না তড়খড় সুদর্শন এই বালক কবি রবির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। বালক কবিও যে নতুন শিক্ষয়িত্রীর প্রতি একই আকর্ষণ অনুভব করতেন তা বলাই বাহুল্য। আন্না তড়খড় রবির কাছে তাঁর একটি নতুন নাম প্রার্থনা করলে বালক রবি শুধুমাত্র 'নলিনী' নামটি দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি; অসাধারণ কবিত্ব বলে ওই নামটি গেঁথে দিয়েছিলেন একটি সুন্দর কবিতায় —

"শুনো নলিনী, খোলো গো আঁখি —
ঘুম এখনো ভাঙিল না কি!
দেখো, তোমারি দুয়ার- 'পরে
সখী, এসেছে তোমারি রবি।।..."[১৫]

পুঁথিগত বিদ্যায় হার মানা এই সদ্য কিশোর কবি তাঁর নতুন শিক্ষয়িত্রীকে শুধুমাত্র নাম নয়, ভৈরবী সুরের গানও দান করেছিলেন। তরুণ কবির কণ্ঠস্বর তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি অকপটে স্বীকার করেছিলেন —

"কবি, তোমার গান শুনলে আমি বোধ হয় আমার মরনদিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি।"[১৬]

এই নারীই প্রথম রবির গানকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। গাছে বসা পাখিকে চিনে নেবার আগে উড়ে গেলেও যেমন তার সুরের ঢাকনা খানা স্মৃতির উপর বিছিয়ে দিয়ে যায় তেমনি রবির জীবনে এই ক্ষণিকের অতিথি স্মৃতির বসনে বুনে দিয়েছিল ফুলকাটা কাজের পাড়। সত্যেন্দ্রনাথের ব্যবস্থাতেই এই স্বীকৃতি মিলেছিল বলেই রবীন্দ্র ব্যক্তিত্বে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর প্রভাব প্রসঙ্গে আন্না তড়খড়ের কথা আপনা থেকেই চলে আসে।

'ছেলেবেলা' গ্রন্থের বিষয়বস্তু বালক রবি আর রচয়িতা প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; এ যেন পথ চলতি পথিকের ফিরে ফিরে দেখা আর নিজের চোখের আলোয় নিজেকে আবিষ্কার করা। জীবনের বহু ঘাট পেরিয়ে যে রবীন্দ্রনাথ এক সফল কীর্তিমান মানুষের স্বীকৃতি পেয়েছেন সেই রবীন্দ্রনাথ যেন স্মৃতিচারণের মাধ্যমে আপন জীবনের অবসিত পর্বের মধ্য থেকে এই সফল মানুষটির প্রাণ শক্তির পথে পুষ্টিকর উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। সহজ গল্পের ছলে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন তাঁর প্রকৃতি প্রেমের উৎসটি কোথায়? অথবা পারিবারিক আবহ থেকে সংগীত চর্চার রসদ কীভাবে মিলেছিল? — তারই বর্ণনা। তাঁর এই বর্ণনা থেকে এই আভাস বিচ্ছুরিত হয় যে, প্রিয়সঙ্গ বঞ্চিত হওয়ার দরুন নিঃসঙ্গতার সূত্রে বালক রবি হয়ে উঠেছিলেন অন্তর্মুখীন। আবার এই নিঃসঙ্গতা এবং অন্তর্মুখীনতা বালক রবিকে করে তুলেছিল কল্পনাপ্রবণ। ইঁট কাঠের স্কুলে অর্থাৎ দশটা চারটার আন্দামানে বাঁধা গতের শিক্ষা বালকটি পাননি বলে তাঁর মনের সজীবতা নষ্ট হয়ে যায়নি। বরং বলা যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো মানুষদের স্নেহসিক্ত সঙ্গ ও প্রশ্রয় পেয়েছিলেন বলেই বালক রবির মনের দিগন্ত নিঃসন্দেহে বর্ধিত হয়েছিল। সুতরাং বালক রবির ব্যক্তিত্ব গঠনে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং ঘটনা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ঠিক তেমনি রবীন্দ্র ব্যক্তিত্ব গঠনে পরিবার পরিজনের প্রভাবও সুদূরপ্রসারী।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'উৎসর্গ', পুনর্মুদ্রণ: চৈত্র ১৩৯৫, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা-৭০০০১৭, পৃ. ৪৫

২. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, 'রবীন্দ্রজীবনকথা', দ্বাদশ মুদ্রণ চৈত্র ১৪২০, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ৫

৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'ছেলেবেলা', পুনর্মুদ্রণ: জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা-৭০০০১৭, পৃ. ১৭

৪. তদেব, পৃ. ৩১

৫. তদেব, 'বালক কবিতা'

৬. তদেব, পৃ. ৪৯

৭. তদেব, পৃ. ৫৪-৫৫

৮. তদেব, পৃ. ৫৫-৫৬

৯. তদেব, পৃ. ৪৯

১০. তদেব, পৃ. ৪৯

১১. তদেব, পৃ. ৬৩

১২. ‘রবীন্দ্ররচনাবলী’, ত্রয়োবিংশ খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ: জুলাই ১৯৫৮, বিশ্বভারতী, ২ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা, পৃ. ১৩

১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘ছেলেবেলা’, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭

১৪. তদেব, পৃ. ৬৯

১৫. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, ‘রবীন্দ্রজীবনকথা’, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘ছেলেবেলা’, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১